ফেলুদা সমগ্র

জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা

সত্যজিৎ রায়

BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

১. হ্যালো-প্রদোষ মিত্র আছেন 2
২. গঙ্গার ইলিশ 15
৩. খুড়িমার ঘর........................... 22

১. হ্যালো–প্রদোষ মিত্র আছেন

হ্যালো–প্রদোষ মিত্র আছেন?

কথা বলছি।

ধরুন–পানিহাটি থেকে কল আছে আপনার…হ্যাঁ, কথা বলুন।

হ্যালো–

আমার নাম শঙ্করপ্রসাদ চৌধুরী। আমি পানিহাটি থেকে বলছি। আমি অবিশ্যি আপনার অপরিচিত, কিন্তু একটা বিশেষ অনুরোধ জানাতে আপনাকে টেলিফোন করছি।

বলুন।

আমার ইচ্ছা আপনি একবার এখানে আসেন।

পানিহাটি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি এখানেই থাকি। গঙ্গার উপরে আমাদের একটা একশো বছরের পুরনো বাড়ি আছে। নাম অমরাবতী। এখানে সকলেই জানে। আপনার কাজের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে, এবং আপনারা যে তিনজন একসঙ্গে ঘোরাফেরা করেন তাও আমি জানি; আমি আপনাদের তিনজনকেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এই শনিবার সকালে এসে–এই ধরুন দশটা নাগাদ-রাত্তিরটা থেকে আবার রবিবার ফিরে যাবেন।

কোনও অসুবিধায় পড়েছেন কি? মানে আমার পেশাটা তো জানেন; কোনও রহস্য–?

তা না হলে আপনাকে ডাকব কেন বলুন? তবে সে বিষয়ে আমি ফোনে বলব না, আপনি এলে বলব। আমার বাড়িটা আপনাদের ভালই লাগবে, ভাল ইলিশ মাছ খাওয়াব, যদি

ভিডিও ক্যাসেটে ছবি দেখতে চান তাও দেখাব, আর তার উপরে আপনার মস্তিষ্ক খাটানার খোরাকও জুটবে বলে মনে হয়।

আমার অবিশ্যি এখন এমনিতে কোনও এনগেজমেন্ট নেই—।

তা হলে চলে আসুন।–দ্বিধা করবেন না। তবে একটা কথা।

কী?

এখানে আমি ছাড়াও কয়েকজন থাকবেন। গোড়ায় আমি কাউকে আপনার আসল পরিচয়টা দিতে চাই না—একটা বিশেষ কারণে।

ছদ্মবেশ নিয়ে আসতে বলছেন?

সেটার হয়তো প্রয়োজন নেই। আপনি তো ফিল্মস্টার নন। যাঁরা এখানে থাকবেন, আমার বিশ্বাস তাঁরা আপনার চেহারার সঙ্গে পরিচিত নন। আপনি শুধু আপনাদের তিনজনের জন্য ভূমিকা বেছে নেবেন। কী ভূমিকা সেটাও আমি সাজেস্ট করতে পারি।

কীরকম?

আমার প্রপিতামহ বনোয়ারিলাল চৌধুরী ছিলেন এক বিচিত্র চরিত্র। তাঁর কথা পরে জানবেন, কিন্তু আমি এইটুকু বলতে পারি। যে তাঁর একটা জীবনী লেখা এমনিতেও বিশেষ দরকার। আপনি যদি ধরুন তাঁর সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে আসেন।

ভেরি গুড। আর আমার বন্ধু—মিঃ গাঙ্গুলী।

আপনার বাইনোকুলার আছে?

তা আছে।

তা হলে ওঁকে পক্ষিবিন্দ করে দিন না। আমার বাগানে অনেক পাখি আসে; ওঁর একটা অকুপেশন হয়ে যাবে।

বেশ। আমার খুড়তুতো ভাইটি হবেন পক্ষিবিদের ভাইপো।

ব্যাস, তা হলে তো হয়েই গেল।

তা হলে পরশু শনিবার সকাল দশটা?

দশটা।

আমরাবতী?

অমরাবতী। আর আমার নাম শঙ্করপ্রসাদ চৌধুরী।

ফেলুদাকে অবিশ্যি টেলিফোনের পুরো ব্যাপারটা আমার জন্য রিপিট করতে হল। বলল, কিছু লোক আছে যাদের কণ্ঠস্বরে এমন একটা ভরসা-জাগানা হৃদ্যতাপূর্ণ ভাব থাকে যে তাদের অনুরোধ এড়ানো খুব মুশকিল হয়।

আমি বললাম, এড়াবে কেন? একে তো একরকম মক্কেল বলেই মনে হচ্ছে। তোমার রোজগারের কথাটাও ভাবতে হবে তো।

আসলে ফেলুদার একটা ব্যাপার আছে। পর পর গোটা দু-তিন কেসে ভাল রোজগার হলে কিছুদিনের জন্য গোয়েন্দাগিরিতে ইস্তফা দিয়ে অন্য জিনিস নিয়ে পড়ে। সে জিনিসে অবিশ্যি রোজগার নেই, শুধু শখের ব্যাপার। এখন ওর সেই অবস্থা চলেছে। এখনকার নেশা হল আদিম মানুষ। সম্প্রতি পূর্ব আফ্রিকার জীবতত্ত্ববিদ রিচার্ড লীকির একটা সাক্ষাৎকার পড়ে ও জেনেছে যে লীকির কিছু আবিষ্কারের ফলে আদিম মানুষের উদ্ভবের সময়টা এক ধাক্কায় লাখ লাখ বছর পিছিয়ে গেছে। ফেলুদা এখন আদিম মানুষ ও তার বানর পূর্ব্যবস্থার ভাবনায় মশগুল। পাঁচবার গেছে মিউজিয়ামে, তিনবার ন্যাশনাল

লাইব্রেরি। আর একবার চিড়িয়াখানা। এক'দিন বলল, একটা থিওরিতে কী বলে জনিস? বলে মানুষ এসেছে আফ্রিকার এক বিশেষ ধরনের খুনে বানর থেকে, যাকে বলে কিলার এপ। আর সেই কারণেই নাকি মানুষের মজ্জায় একটা হিংস্র প্রবৃত্তি রয়ে গেছে—যেটা প্রকাশ পায় যুদ্ধে, দাঙ্গায় আর খুন-খারাপিতে।

পানিহাটিতে মানুষের এই হিংস্র প্রবৃত্তির কোনও নমুনা ও আশা করছে কি না জানি না, তবে এটা জানি যে মাঝে মাঝে ওর কলকাতা ছেড়ে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য বাইরে ঘুরে আসতে ভালই লাগে। এইতো সেদিন আমরা লালমোহনবাবুর গাড়িতে গিয়ে বর্ধমানের রাস্তায় পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত ঐতিহাসিক গম্বুজ আর হিন্দু মন্দিরের উপরে তৈরি ষোড়শ শতাব্দীর মুসলমান মসজিদ দেখে এলাম।

লালমোহনবাবুর ড্রাইভার হরিপদবাবু দশ দিনের ছুটিতে দেশে গেছেন বলে ফেলুদাকেই তাঁর জায়গা নিতে হল। পথে যেতে যেতে লালমোহনবাবু বললেন, দিলেন তো মশাই একটা দায়িত্ব আর একটা বাইনোকুলার আর দুখানা বই ঘাড়ে চাপিয়ে; এদিকে গড়পারে তো কাক চড়ুই ছাড়া কোনও পাখি কোনওদিন দেখিচি বলে মনে পড়ে না।

বই দুটো হল সেলিম আলির ইন্ডিয়ান বার্ডস আর অজয় হোমের বাংলার পাখি।

ফেলুদা বলল, কুছ পরোয়া নেহী। মনে রাখবেন, কাক হল করভাস স্‌প্লেন্‌ডেন্‌স, চড়ুই হল পাসের ডোমেস্টিকাস। সব সময় ল্যাটিন নাম বলতে গেলে জিভ জড়িয়ে যাবে, তাই ইংরিজি নামও ব্যবহার করতে পারেন—যেমন ফিঙেকে ড্রঙ্গো, টুনটুনিকে টেলর বার্ড, ছাতারেকে জাঙ্গল ব্যাবলার। আর পাখি না দেখলেও, মাঝে মাঝে বাইনোকুলার চোখে লাগালেই অনেকটা কাজ দেবে।

আমার নামও তো একটা চাই বললেন লালমোহনবাবু।

আপনি হলেন ভবতোষ সিংহ, আপনার ভাইপো প্রবীর আর আমি সোমেশ্বর রায়। পৌনে নটায় রওনা হয়ে আমরা দশটা বেজে পাঁচে পানিহাটিতে শঙ্করপ্রসাদ চৌধুরীর বাড়ি

অমরাবতীতে পৌঁছে গেলাম। আমাদের গাড়ি দেখেই বন্দুকধারী গুখ দারোয়ান এসে বিকট ক্যাঁ-চ শব্দে লোহার গেট খুলে দিল।

ফেলুদা বলে, গল্পের শুরুতেই একগাদা বর্ণনা হাড় হড় করে ঢেলে দিলে পাঠক হাবুডুবু খায়; ওটা দিবি গল্পের ফাঁকে ফাঁকে। তাই শুধু বলছি—বিশাল জমির ওপর লাল বাড়িটা পোল্লায়, থমথমে আর অনেকটা বিলিতি কাসলের ধাঁচে তৈরি। বাড়ির দক্ষিণে ফুলবাগান, তার পরে গাছপালা রাখার কাচের ঘর, আর তারও পরে ফলবাগান। নুড়ি বিছানা প্যাঁচালো পথ দিয়ে আমরা সদর দরজায় পৌঁছলাম।

বাড়ির মালিক গাড়ির শব্দ পেয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, আমরা নামলে হেসে বললেন, ওয়েলকাম টু অমরাবতী। এর বর্ণনা হল—মাঝারি হাইট, ফরসা রং, বয়স পঞ্চাশ-টঙ্কাশ। পরনে পায়জামা আর আদির পাঞ্জাবি, পায়ে শুড় তোলা লাল চটি, ডান হাতে চুরুট।

আমার খুড়তুতো ভাই জয়ন্তও কাল এসেছে, তাকেও দলে টেনে নিয়েছি। অর্থাৎ সে আপনার আসল পরিচয় জানলেও অন্যদের সামনে প্রকাশ করবে না।

অন্যরা কি এসে গেছেন? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

না। তাঁরা আসবেন বিকেলে। চলুন, একটু বসে জিরোবেন। আর সেই সুযোগে কিছু কথাও হবে।

আমরা বাড়ির পশ্চিমদিকের বিরাট চওড়া বারান্দায় গিয়ে বসলাম। সামনে দিয়ে গঙ্গা বয়ে চলেছে, দেখলেও চোখ জুড়িয়ে যায়। অমরাবতীর প্রাইভেট ঘাটও দেখতে পাচ্ছি। সামনে ডান দিকে। একটা তোরণের নীচ দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে জল অবধি।

ওই ঘাট কি ব্যবহার হয়? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

হয় বইকী, বললেন শঙ্করবাবু। আমার খুড়িমা থাকেন তো এখানে। উনি রোজ সকালে গঙ্গাস্নান করেন।

উনি একা থাকেন এ বাড়িতে?

এক কেন? আমিও তো দু বছর হল এখানেই থাকি। টিটাগড় আমার কাজের জায়গা। কলকাতায় আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়ির চেয়ে এ বাড়ি অনেক কাছে হয়।

আপনার খুড়িমার বয়স কত?

সেভেনটি এইট। আমাদের পুরনো চাকর অনন্ত ওঁর দেখাশোনা করে। এমনিতে

আর মাথায় সামান্য ছিট দেখা দিয়েছে। নাম ভুলে যান, খেতে ভুলে যান, মাঝরাত্তিরে পান ছাঁচতে বসেন—এই আর কী। ঘুম তো এমনিতে খুবই কম— রাত্তিরে ঘণ্টা দুয়েকের বেশি নয়। আসলে চার বছর আগে কাকা মারা যাওয়ার পর উনি আর কলকাতায় থাকতে চাননি। এখানে থাকাটা ওঁর কাছে একরকম কাশীবাসের মতো।

বেয়ারা ট্রেতে করে চা আর মিষ্টি নিয়ে এল।

দুপুরে খেতে খেতে সেই একটা-দেড়টা হবে, বললেন শঙ্করবাবু, কাজেই আপনার মিষ্টিটার সদ্ব্যবহার করুন। এ মিষ্টি কলকাতায় পাবেন না।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে একটা চুমুক দিয়ে ফেলুদা বলল, আমাদের আসল আর নকল দুটো পরিচয়ই তো জানেন, এবার আপনাদের পরিচয়টা পেলে ভাল হত। আপনি কী করেন জিজ্ঞেস করাটা কি অভদ্রতা হবে?

মোটেই না, বললেন শঙ্করবাবু।আপনাকে ডেকেছি তো সব কথা খুলে বলবার জন্যেই; না হলে আপনি কাজ করবেন কী করে?—সোজা কথায় আমি হলাম ব্যবসাদার। বুঝতেই পারছেন, এত বড় বাড়ি যখন মেনটেন করছি তখন ব্যবসা আমার মোটামুটি ভালই চলে।

আপনার কি বংশানুক্রমিক ব্যবসা?

না। এ বাড়ি তৈরি করেন আমার প্রপিতামহ–বনোয়ারিলাল চৌধুরী।

অর্থাৎ যাঁর জীবনী লিখতে যাচ্ছি। আমি?

এগজ্যাক্টলি। তিনি ছিলেন রামপুরের ব্যারিস্টার। অগাধ পয়সা করে শেষ বয়সে কলকাতায় চলে আসেন; এসে এই বাড়িটা তৈরি করেন। উনি এখানেই থাকতেন, এখানেই মৃত্যু হয়। ঠাকুরদাদাও ব্যারিস্টার ছিলেন, তবে তাঁর পিসার আমার প্রপিতামহের মতো ছিল না। তার দুটো কারণ–জুয়া আর মন্দ। তার ফলে চৌধুরী পরিবারের অবস্থা কিছুটা পড়ে যায়। বাড়িতে বনোয়ারিলালের কিছু মূল্যবান সম্পত্তি ছিল–সেগুলোর কথায় পরে আসছি–তার কিছু আমার ঠাকুরদাদা বিক্রি করে দেন। ব্যবসা শুরু করেন আমার বাবা, আর তার ফলে বংশের ভিত খানিকটা মজবুত হয়। তারপর আমি।

জয়ন্ত ব্যবসায় যায়নি। সে আছে।

এক, এনজিনিয়ারিং ফার্মে। ভালই রোজগার করে, তবে ইদানীং শুনছি ক্লাবে গিয়ে পোকার খেলছে। ঠাকুরদাদার একটা গুণ পেয়েছে। আর কী? জয়ন্ত আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট।

এই ফাঁকে ফেলুদা পকেট থেকে তার মাইক্রোক্যাসেট রেকডারটা বার করে চালু করে দিয়েছে। এটা হংকং থেকে আনা। আজকাল মক্কেলের কথা খাতায় না লিখে রেকর্ডারে তুলে নেয়, তাতে অনেক বেশি সুবিধা হয়।

শঙ্করবাবু বললেন, আত্মীয়ের কথা তো হল, এবার অনাত্মীয়ের প্রসঙ্গে আসা যাক।

তার আগে একটা প্রশ্ন করে নিই বলল ফেলুদা।যদিও প্রায় ঘষে উঠে গেছে, তবুও মনে হচ্ছে আপনার কপালে একটা চন্দনের ফোঁটা দেখতে পাচ্ছি। তার মানে–

তার মানে আর কিছুই না, আজ হল আমার জন্মতিথি। ফোঁটাটা দিয়েছেন খুড়িমা।

জন্মতিথি বলেই কি আজ এখানে অতিথি সমাগম হবে?

অতিথি বলতে মাত্র তিনজন। গত বছর ছিল ফিফটিয়েথ বার্থডে, সেবারও ডেকেছিলাম এই তিনজনকেই। ভেবেছিলাম। ওই একটি বারই তিথি পালন করব। কিন্তু একটা বিশেষ কারণে এবারও করছি। বুঝতেই পারছেন, এ বাড়িতে যাঁরা একবার এসেছেন, তাঁদের দ্বিতীয়বার আসতে কোনও আপত্তি হবে না।

এই দ্বিতীয়বারের কারণটা কী?

শঙ্করবাবু একটু ভেবে বললেন, খুব ভাল হয় আপনারা যদি চা খেয়ে একবারটি দোতলায় আসেন আমার সঙ্গে—আমার খুড়িমার ঘরে। তা হলে বাকি ঘটনাটা বুঝতে সহজ হবে। আর আমিও ব্যাপারটা গুছিয়ে বলতে পারব।

আমরা মিনিটখানেকের মধ্যেই উঠে পড়লাম।

সিঁড়িতে পৌঁছাতে হলে বৈঠকখানা দিয়ে যেতে হয়। এখানে বলে রাখি—বহারের আসবাব, কার্পেট, মখমলের পদা, ঝাড়লণ্ঠন, শ্বেতপাথরের মূর্তি ইত্যাদি মিলিয়ে এমন জমজমাট বৈঠকখানা আমি বেশি দেখিনি।

সিঁড়ি উঠতে উঠতে ফেলুদা বলল, আপনার খুড়িমা ছাড়া দোতলায় আর কে থাকেন?

খুড়িমা থাকেন উত্তর প্রান্তে, বললেন শঙ্করবাবু, আর দক্ষিণে থাকি আমি। জয়ন্ত এলেও দক্ষিণেরই একটা ঘরে থাকে।

দোতলার ল্যান্ডিং পেরিয়ে আমরা ঢুকলাম খুড়িমার ঘরে। বেশ বড় ঘর, কিন্তু এতে কোনও জাঁকজমক নেই। পশ্চিমে দরজার বাইরে আলো আর বাতাসের বহর দেখে বোঝা যায়। ওদিকেই গঙ্গা। দরজার পাশেই বুড়ি মাদুরে বসে মালা জাপছেন। তাঁর পাশে একটা

হামানদিস্তা, একটা পানের বাটা আর একটা মোটা বই। নির্ঘাত রামায়ণ কি মহাভারত হবে। আসবাব বলতে একটা খাট আর একটা ছোট আলমারি।

আমরা ঘরে ঢুকতেই খুড়িমা মাথা তুলে পুরু চশমার ভিতর দিয়ে আমাদের দিকে চাইলেন।

কজন অতিথি এসেছেন কলকাতা থেকে, বললেন শঙ্করবাবু।

তাই এই ঘাটের মড়াকে দেখাতে আনলি?

আমরা তিনজনে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতে বৃদ্ধ বললেন, তা বাপু তোমাদের পরিচয় জেনে আর কী হবে, নাম তো মনে থাকবে না। নিজের নামটাই ভুলে যাই মাঝে মাঝে। এখন তো বসে বসে দিন গোনা।

আসুন–

শঙ্করবাবুর ডাকে আমরা ঘুরলাম। বৃদ্ধ আবার বিড়বিড় করে মালা জপতে শুরু করলেন।

এবার দেখলাম ঘরের উলটাদিকে খাটের পাশে একটা প্রকাণ্ড সিন্দুক রয়েছে। শঙ্করবাবু পকেট থেকে চাবি বার করে সিন্দুকটা খুলতে খুলতে বললেন, এবারে আপনাদের যে জিনিস দেখাব সে হল আমার প্রপিতামহের সম্পত্তি। রামপুরে থাকতে বহু নবাব-তালুকদার তাঁর মক্কেল ছিলেন। এগুলো তাঁদের উপঢৌকন। এরই বেশ কিছু আমার ঠাকুরদাদা বিপাকে পড়ে বেচে দিয়েছিলেন। তবে তার পরেও কিছু আছে। যেমন এই যে দেখুন–

শঙ্করবাবু একটা থলি বার করে তার মুখটা ফাঁক করে হাতের তেলোয় উপুড় করলেন। ঝনঝন করে কিছু গোল চাকতি তেলোয় পড়ল।

জাহাঙ্গীরের আমলের স্বর্ণমুদ্রা, বললেন শঙ্করবাবু।দেখুন, প্রত্যেকটিতে একটি করে রাশির ছবি খোদাই করা। এই জিনিস একেবারেই দুষ্প্রাপ্য।

রাশিচক্র হলে এগারোটা কেন? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।বারোটা হওয়া উচিত নয় কি? একটা মিসিং।

আমরা পরস্পরের দিকে চাইলাম।

আরও জিনিস আছে, বললেন শঙ্করবাবু, সেগুলো এই আইভরির বাক্সটার মধ্যে। সোনার উপর চুনি বসানা ইটালিয়ান নস্যির কৌটো, জেড পাথরে চুনি আর পান্না বসানা মোগল সুরাপত্র, আংটি, লকেট...কিন্তু সে সব আপনারা দেখবেন আজ সন্ধ্যাবেলা, সর্বসমক্ষে। এখন নয়।

এর চাবি তো আপনার কাছেই থাকে? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ, আমার কাছেই। একটা ডুপলিকেট আছে, থাকে খুড়িমার আলমারিতে।

কিন্তু সিন্দুক আপনার ঘরে নয় কেন?

এ ঘরটা অতীতে ছিল আমার প্রপিতামহের ঘর। সিন্দুক তাঁরই আমলের। ওটা আর সরাইনি। আর কড়া পাহারা আছে গেটে, এ ঘরে খুড়িমা প্রায় সর্বক্ষণ থাকেন, তাই এক হিসেবে ওটা এখানে যথেষ্ট সেফ।

আমরা আবার নীচের বারান্দায় ফিরে এলাম। চেয়ারে বসার পর ফেলুদা টেপরেকডার চালু করে দিয়ে বলল, একটি মুদ্রা মিসিং হল কী করে?

সে কথাই তো বলছি, বললেন শঙ্করবাবু। তিনজনকে উইক এন্ডে নেমন্তান্ন করেছিলাম গত জন্মতিথিতে। একজন হলেন আমার বিজনেস পার্টনার নরেশ কাঞ্জিলাল। আরেকজন এখানকারই ডাক্তার অর্ধেন্দু সরকার। আর তৃতীয় ব্যক্তি হলেন কালীনাথ রায়। ইনি

ইস্কুলে আমার সহপাঠী ছিলেন; পিঁয়ত্রিশ বছর পর আবার, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমার প্রপিতামহের মহামূল্য সম্পত্তির কথা। এঁরা সকলেই শুনেছিলেন, কিন্তু চোখে দেখেননি। আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী রাত্তিরে ডিনারের পর জয়ন্ত সিন্দুক থেকে স্বর্ণমুদ্রার থলিটা বার করে নীচে বৈঠকখানায় আনে। কয়েনগুলো টেবিলের উপর ছড়িয়ে রেখেছি, সকলে ঘিরে দেখছে, এমন সময় হল লোডশেডিং। ঘর অন্ধকার। এটা অবিশ্যি অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। চাকর দুমিনিটের মধ্যে মামবাতি নিয়ে আসল, আমি কয়েনগুলো তুলে নিয়ে আবার সিন্দুকে রেখে এলাম। একটা যে কমে গেছে সেটা তখন খেয়াল করিনি। এমন যে হতে পারে কল্পনাও করিনি। পরদিন সকলে চলে যাবার পর মনে একটা খটকা লাগাতে সিন্দুক খুলে দেখি কর্কট রাশির মুদ্রাটি নেই।

কয়েনগুলো আপনিই তুলে রেখেছিলেন?

হ্যাঁ, আমি। ব্যাপারটা বুঝুন। মিঃ মিত্তির। তিনজন নিমন্ত্রিত। একজনকে পাঁচশ বছর চিনি–আমার বিজনেস পার্টনার। অর্ধেন্দু সরকার হলেন ডাক্তার এবং ভালই ডাক্তার। খড়দা টিটাগড় থেকে কল আসে ওঁর। আর কালীনাথ আমার বাল্যবন্ধু।

কিন্তু এদের সকলকেই কি অনেস্ট লোক বলে জানেন আপনি?

সেখানেই অবিশ্যি গণ্ডগোল। কাঞ্জিলালের কথা ধরুন। ব্যবসায় অনেকেই জেনেশুনে অসৎ পন্থা নেয়, কিন্তু কাঞ্জিলালের মতো এমন অম্লান বদনে নিতে আমি আর কাউকে দেখিনি। আমাকে ঠাট্টা করে বলে–তুমি ধর্মযাজক হয়ে যাও, তোমার দ্বারা ব্যবসা হবে না।

আর অন্য দুজন?

ডাক্তারের কথা আমি জানি না। খুড়িমা মাঝে মাঝে বাতে ভোগেন, ডাক্তার তাঁকে এসে দেখে যান। এর বেশি জানি না। তবে কালীনাথ বোধহয় গভীর জলের মাছ। এক যুগ দেখা নেই, হঠাৎ এক'দিন টেলিফোন করে আমার কাছে এল। বলল-বয়স যত বাড়ছে ততই পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে। তাই একবার ভাবলাম তোমার সঙ্গে দেখা করি।

আপনি তাঁকে দেখেই চিনেছিলেন?

তা চিনেছিলাম। তা ছাড়া ইস্কুলের বহু পুরনো গল্প করল। সে যে আমার সহপাঠী তাতে সন্দেহ নেই। গোলমালটা হচ্ছে, সে যে এখন কী করে তা কিছুতেই ভেঙে বলে না। জিজ্ঞেস করলেই বলে, ধরে নাও তোমারই মতো ব্যবসা করে। এদিকে গুণ যে নেই। তা নয়। খুব আমুদে রসিক লোক। ইস্কুলে থাকতে ম্যাজিক দেখাত, এখনও সে অভ্যাসটা রেখেছে। হাত সাফাই রীতিমতো ভাল।

আপনার ভাইও তো অন্ধকারের মধ্যে ঘরে ছিলেন।

সে ছিল। তবে সে তো এ জিনিস আগে দেখেছে, তাই সে টেবিলের কাছে ছিল না। নিয়ে থাকলে ওই তিনজনের একজনই নিয়েছে।

তারপর আপনি কী করলেন?

কী আর করতে পারি বলুন। এমন লোক আছে যারা এই অবস্থায় সোজাসুজি পুলিশ ডেকে তিনজনের বাড়ি সার্চ করাত। কিন্তু আমি পারিনি। ওই তিনজনের সঙ্গে বসে কত ব্রিজ খেলেছি, আর তাদের একজনকে বলব চোর?

তার মানে স্রেফ হজম করে গেলেন ব্যাপারটা?

স্রেফ হজম করে গেলাম। ফলে এখনও কেউ জানেই না যে আমি ব্যাপারটা টের পেয়েছি। সেই ঘটনার পরেও তো এদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কতবার, কিন্তু কেউ তো কোনওরকম অসোয়াস্তি বা অপরাধ বোধ করছে বলে মনে হয়নি। অথচ আমি জানি যে এই তিনজনের মধ্যেই একজন দোষী। একজন চোর।

আমরা তিনজনেই চুপ। ঘটনাটা অদ্ভুত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ অবস্থায় কী করা যায়?

আমার মনের প্রশ্নটা ফেলুদাই করল। শঙ্করবাবু বললেন, এরা জানে যে আমি এদের সন্দেহ করি না। তাই এদের আবার ডেকেছি, এবং আজ রাত্রে আমি আবার এদের সামনে বনোয়ারিলালের কিছু মূল্যবান জিনিস বার করব। মাসখানেক থেকে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সন্ধ্যা সাতটায় লোডশেডিং হচ্ছে এখানে। তার ঠিক আগে আমি জিনিসগুলো টেবিলে সাজাব। ঘর আবার অন্ধকার হবে। আশা করছি সেই অন্ধকারে চোরের প্রবৃত্তি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। সব মিলিয়ে এই সম্পত্তির মূল্য চল্লিশ-পঞ্চাশ লাখের কম নয়। হয়তো আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস চোর লোভ সামলাতে পারবে না। চুরির পর আপনি আপনার আসল ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। তখন প্রদোষ মিত্তিরের কাজ হবে চোর ধরা এবং চোরাই মাল বার করা।

ফেলুদা বলল, আপনার ভাই এ সম্বন্ধে কী বলেন?

সেও তো কাল অবধি কিছুই জানত না, বললেন শঙ্করবাবু, কাল আপনাকে ইনভাইট করার পর ওকে বলি।

উনি কী বললেন?

খুব চাটপাট করল। বলল–তুমি অ্যাদ্দিন চেপে রেখেছ ব্যাপারটা।–তখন তখনই পুলিশে খবর দেওয়া উচিত ছিল। এক বছর পরে কি মিঃ মিত্তির কিছু করতে পারবেন, ইত্যাদি।

একটা কথা বলব মিঃ চৌধুরী?

বলুন।

আপনি মানুষটা এত নরম বলেই কিন্তু চোর তার সুযোগটা নিয়েছিল। অতিথিকে চুরির অপবাদ দিতে সবাই পেছপা হত না।

সেটা জানি। সেই জন্যই তো আপনাকে ডাকা। আমি যেটা পারিনি, সেটা আপনি পারবেন।

২. গঙ্গার ইলিশ

সরষেবাটা দিয়ে চমৎকার গঙ্গার ইলিশ সমেত দুপুরের খাওয়াটা হল ফাস্ট ক্লাস। জয়ন্তবাবুর সঙ্গে আলাপ হল খাবার টেবিলে। ইনি মাঝারি হাইটের চেয়েও কম, বেশ সুস্থ, সবল মানুষ। শঙ্করবাবুর পাসোনালিটি এঁর নেই, কিন্তু বেশ হাসিখুশি চালাক চতুর লোক।।

খাবার পর শঙ্করবাবু বললেন, আপনাদের এখন আর ডিস্টার্ব করব না, যা মন চায় করুন। আমি একটু গড়িয়ে নিই। বিকেলে চায়ের সময় বারান্দায় আবার দেখা হবে।

আমরা জয়ন্তবাবুর সঙ্গে বাড়ির আশপাশটা ঘুরে দেখব বলে বেরোলাম।

পশ্চিম দিকে একটানা একটা নিচু থামওয়ালা পাঁচিল চলে গেছে নদীর ধার দিয়ে। পাঁচিলের পরেই জমি ঢালু হয়ে নেমে গেছে জল অবধি। এই পাঁচলাই বাকি তিনদিকে হয়ে গেছে। দেড় মানুষ উঁচু। জয়ন্তবাবুর ফুলের শখ, তাই তিনি আমাদের বাগানে নিয়ে গিয়ে গোলাপ সম্বন্ধে একটা ছাটখাটা বক্তৃতা দিয়ে দিলেন। গোলাপ যে তিনশো রকমের হয় তা এই প্রথম জানলাম।

বাড়ির উত্তরে গিয়ে দেখলাম সেদিকে আর একটা গেট রয়েছে। শহরে কোথাও যেতে হলে এই গোটটাই নাকি ব্যবহার করা হয়।

আরেকটা সিঁড়িও রয়েছে এদিকে। জয়ন্তবাবু বললেন খুড়িমা, মানে ওঁর মা, গঙ্গাস্নানে যেতে ওটাই ব্যবহার করেন। একতলায় নদীর দিকে আর গঙ্গার দিকে চওড়া বারান্দা, দুদিক দিয়েই সিঁড়ি রয়েছে নীচে নামার জন্য।

দেখা শেষ হলে পর আমরা ঘরে ফিরে এলাম। জয়ন্তবাবু কাচের ঘরে চলে গেলেন অর্কিড দেখার জন্য।

আমাদের থাকার জন্য একতলায় একটা প্যাসেজের এক দিকে পর পর দুটো ঘর দেওয়া হয়েছে। উলটোদিকে আরও তিনটে পাশাপাশি ঘর দেখে মনে হল তাতেই বোধহয় তিনজন অতিথি থাকবেন। ঘরে ঢুকে বাহারে খাটে নরম বিছানা দেখে লালমোহনবাবু বোধহয় দিবানিদ্রার তাল করছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বললেন, পাখির বইগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া দরকার।

আমি একটা কথা ফেলুদাকে না জিজ্ঞেস করে পারলাম না।

আচ্ছা, এক বছর আগে যে লোক চুরি করেছে, সে যদি এবার আর চুরি না করে, তা হলে তুমি চার ধরবে কী করে?

ফেলুদা বলল, সেটা এই তিন ভদ্রলোককে স্টাডি না করে বলা শক্ত। যার মধ্যে চুরির প্রবৃত্তি রয়েছে, তার সঙ্গে আর পাঁচটা অনেস্ট লোকের একটা সূক্ষ্ম তফাত থাকা উচিত। চোখ-কান খোলা রাখলে সে তফাত ধরা পড়তে পারে। ভুলিস না, যে লোক চুরি করে তার বাইরেট যতই পালিশ করা হোক না কেন তাকে আর ভদ্রলোক বলা চলে না। সত্যি বলতে কী, ভদ্রলোক সাজার জন্য তাকে যথেষ্ট অভিনয় করতে হয়।

বিকেলে পর পর দুটো গাড়ির আওয়াজ পেয়ে বুঝলাম অতিথিরা এসে গেছেন। বারান্দায় চায়ের আয়োজন হলে পর শঙ্করবাবুই আমাদের ডেকে নিয়ে গেলেন তিন গেস্টের সঙ্গে আলাপ করানোর জন্যে।

ডাঃ সরকার এক মাইলের মধ্যে থাকেন, ইনি হেঁটেই এসেছেন। বছর পঞ্চাশ বয়স, চোখে চশমা, মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে, গোঁফটা কাঁচা হলেও, কানের পাশের চুলে পাক ধরেছে।

নরেশ কাঞ্জিলাল বিরাট মানুষ, ইনি সুন্ট-টাই পরে সাহেব সেজে এসেছেন। ফেলুদার পরিচয় জেনে বললেন, বনোয়ারিলালের জীবনী লেখার কথা আমি শঙ্করকে অনেকবার

বলেছি। আপনি এ কাজের ভারটা নিয়েছেন শুনে খুশি হলাম। হি ওয়াজ এ রিমার্কেবল ম্যান।

মজার লোক হলেন কালীনাথ রায়। এর কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলছে, তাতে হয়তো ম্যাজিকের সরঞ্জাম থাকতে পারে। লালমোহনবাবুর সঙ্গে পরিচয় হতেই বললেন, পক্ষিবিদ যে মুরগির ডিম পকেটে নিয়ে ঘোরে তা তো জানতুম না মশাই। কথাটা বলেই খপ করে লালমোহনবাবুর পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা মুরগির ডিমের সাইজের মসৃণ সাদা পাথর বার করে দিয়ে আক্ষেপের সুরে বললেন, এ হে হে, এ যে দেখেছি পাথর; আমি তো ফ্রাই করে খাবার মতলব করেছিলুম!

কথা হল রাত্তিরে খাবার পর কালীনাথবাবু তাঁর হাতসাফাই দেখবেন।

সূর্য হেলে পড়েছে, গঙ্গার জল চিক্ চিক্ করছে, ঝিরিঝিরে হাওয়া, তাই বোধহয় নরেশবাবু আর কালীনাথবাবু নেমে গেলেন বাইরের শোভা উপভোগ করতে। লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই উস্খুস্ করছিলেন, এবার বাইনোকুলার বার করে উঠে পড়ে বললেন,দুপুরে যেন একটা প্যারাডাইজ ফ্লাইক্যাচারের ডাক শুনেছিলুম। দেখি তো পাখিটা আশেপাশে আছে কি না।

ফেলুদার গম্ভীর মুখ দেখে আমিও হাসিটা কোনওমতে চেপে গেলাম।

ডাক্তার সরকার চায়ে চুমুক দিয়ে শঙ্করবাবুর দিকে ফিরে বললেন, আপনার ভ্রাতাটিকে দেখছি না-সে কি বাগানে ঘুরছে নাকি?

ওর ফুলের নেশার কথা তো আপনি জানেন।

ওঁকে তো বলেছি মাথায় টুপি না পরে যেন রোদে না ঘোরেন। সে আদেশ তিনি মেনেছেন কি?

জয়ন্ত কি ডাক্তারের আদেশ মানার লোক? আপনি তাকে চেনেন না?

ফেলুদা যে চারমিনার হাতে আড়চোখে ডাক্তারের কথাবার্তা হাবভাব লক্ষ করে যাচ্ছে সেটা বেশ বুঝতে পারছি।

আপনার খুড়িমা কেমন, আছেন? শঙ্করবাবুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন ডাঃ সরকার।

এমনিতে তো ভালই, বললেন শঙ্করবাবু, তবে অরুচির কথা বলছিলেন যেন। আপনি একবার ঢুঁ মেরে আসুন না।

তাই যাই

ডাঃ সরকার চলে গেলেন খুড়িমাকে দেখতে। প্রায় একই সঙ্গে জয়ন্তবাবু ফিরে এলেন। বাগান থেকে-ঠোঁটের কোণে হাসি।

কী ব্যাপার? হাসির কী হল? জিজ্ঞেস করলেন শঙ্করবাবু।

জয়ন্তবাবু টি পট থেকে কাপে চা ঢেলে নিয়ে ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, আপনার বন্ধু কিন্তু চোখে বাইনাকুলার লাগিয়ে বেদম অভিনয় করে যাচ্ছেন পক্ষিবিদের।

ফেলুদাও হেসে বলল, অভিনয় তো আজ সকলকেই করতে হবে অল্পবিস্তর। আপনার দাদার পরিকল্পনাটাই তো নাটকীয়।

জয়ন্তবাবু গভীর হয়ে গেলেন।

আপনি কি দাদার পরিকল্পনা অ্যাপ্রভ করেন?

আপনি করেন না বলে মনে হচ্ছে? বলল ফেলুদা।

মোটেই না, বললেন জয়ন্তবাবু। আমার ধারণা চোর অত্যন্ত সেয়ানা লোক। সে কি আর বুঝবে না যে তার জন্য ফাঁদ পাতা হচ্ছে? সে কি জানে না যে দাদা অ্যাদ্দিনে টের পেয়েছে যে সিন্দুকের একটি মূল্যবান জিনিস গায়েব হয়ে গেছে?

সবই বুঝি, বললেন শঙ্করবাবু, কিন্তু তাও আমি ব্যাপারটা ট্রাই করে দেখতে চাই। ধরে নাও এটা আমার গোয়েন্দা কাহিনী প্রীতির ফল।

না। শুধু ইটালিয়ান নস্যির কৌটো আর মোগলাই সুরাপাত্র। ডাঃ সরকার খুড়িমাকে দেখতে গেছেন। উনি এলেই তুমি ওপরে গিয়ে জিনিস দুটো বার করে আনবে। আমি পকেটে রেখে দেব। এই নাও চাবি।

জয়ন্তবাবু অনিচ্ছার ভাব করে চাবিটা নিলেন।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ডাঃ সরকার ফিরে এলেন। ভদ্রলোক হেসে বললেন, দিবি ভাল আছেন। আপনার খুড়িমা। বারান্দায় বসে দুধভাত খাচ্ছেন। আপনাদের আরও অনেক'দিন জ্বালাবেন।

জয়ন্তবাবু চুপচাপ উঠে পড়লেন।

কী বসে আছেন চেয়ারে? ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন ডাঃ সরকার। চলুন। একটু হাওয়া খাবেন!! এ হাওয়া কলকাতায় পাবেন না।

শঙ্করবাবু সমেত আমরা চারজনই সিঁড়ি দিয়ে নামলাম। বাঁয়ে চেয়ে দেখি লালমোহনবাবু বাগানের মাঝখানে একটা শ্বেতপাথরের মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে এদিক ওদিক দেখছেন। পেলেন। আপনার প্যারাডাইজ ফ্লাইক্যাচারের দেখা? জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

না, তবে এইমাত্র একটা জঙ্গল বাবলার দেখলুম মনে হল।

এখন পাখিদের বাসায় ফেরার সময়, বলল ফেলুদা। এর পরে প্যাচা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবেন না।

বাকি দুজনে গেলেন কোথায়? বাড়ির সামনের দিকে কি, না কাচের ঘরের পিছনে ফলাবাগানে?

শঙ্করবাবুর বোধহয় একই প্রশ্ন মনে জেগেছিল, কারণ উনি হাঁক দিয়ে উঠলেন–কই হে, নরেশ? কালীনাথ গেলে কোথায়?

একজনকে দেখলুম। এদিকের সিঁড়ি দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকতে, বললেন। লালমোহনবাবু।

কোনজন? প্রশ্ন করলেন শঙ্করবাবু।

বোধহয় সেই ম্যাজিশিয়ান ভদ্রলোক।

কিন্তু লালমোহনবাবু ভুল দেখেছিলেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন কালীনাথবাবু নয়, নরেশ কাঞ্জিলাল।

সন্ধের দিকে ঝাঁপ করে টেমপারেচারটা পড়ে, বললেন কাঞ্জিলাল, তাই আলোয়ানটা চাপিয়ে এলাম।

আর কালীনাথ? প্রশ্ন করলেন শঙ্করবাবু।

সে তো বাগানে নেমেই আলাদা হয়ে গেল! বলছিল শুকনো ফুলকে টাটকা করে দেবার একটা ম্যাজিক দেখাবে, তাই–

মিঃ কাঞ্জিলালের কথা আর শেষ হল না, কারণ সেই সময় বুড়ে চাকর অনন্তর চিৎকার শোনা গেল।

দাদাঝাবু!

অনন্ত গঙ্গার দিকে বারান্দায় সিঁড়ি দিয়ে নেমে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ছুটে এল আমাদের দিকে।

কী হল অনন্ত? শঙ্করবাবু উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করে এগিয়ে গেলেন।

ছোট দাদাবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন দোতলায়।

৩. খুড়িমার ঘর

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠে ল্যান্ডিং পেরিয়েই খুড়িমার ঘর, সেটা আগেই বলেছি। জয়ন্তবাবু সেই ঘরের চৌকাঠের হাত তিনেক এদিকে চিত হয়ে পড়ে আছেন, তাঁর মাথার পিছনের মেঝেতে খানিকটা রক্ত চুঁইয়ে পড়েছে।

ডাক্তার সরকার দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠে সবচেয়ে আগে পৌঁছে জয়ন্তবাবুর নড়ি টিপে ধরলেন। ফেলুদাও প্রায় একই সঙ্গে পৌঁছে জয়ন্তবাবুর পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছে। তার মুখ গম্ভীর, কপালে খাঁজ।

কী মনে হচ্ছে? চাপা গলায় প্রশ্ন করলেন শঙ্করবাবু।

পালস সামান্য দ্রুত, বললেন ডাঃ সরকার।

মাথার জখমটা?

মনে হচ্ছে পড়ে গিয়ে হয়েছে। এই সময় খালি মাথায় রোদে ঘোরা ডেনজারাস সেটা অনেকবার বলেছি ওঁকে।

কনকাশন–?

সেটা তা পরীক্ষা না করে বলা সম্ভব না। আজ আবার আমি যন্ত্রপাতি কিছুই আনিনি সঙ্গে। একবার হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে ভাল হত।

তই করুন না। গাড়ি তো রয়েছে।

ভদ্রলোক বেশ ভাল ভাবেই অজ্ঞান হয়েছেন, কারণ ফেলুদা সমেত চারজন ধরাধরি করে গাড়িতে তোলার সময়ও তাঁর জ্ঞান হল না। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় অবিশ্যি

কালীনাথবাবুর সঙ্গেও দেখা হল। বললেন, আমি জাস্ট ওষুধটা খাবার জন্য ঘরে গেছি– আর তার মধ্যে এই কাণ্ড!

আমি সঙ্গে আসব কি? শঙ্করবাবু ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন।

কোনও দরকার নেই, বললেন ডাঃ সরকার, আমি হাসপাতাল থেকে আপনাকে ফোন করব।

গাড়ি চলে গেল। এই দুর্ঘটনার জন্য শঙ্করবাবুর প্ল্যান যে ভেস্তে গেল সেটা বুঝতে পারছি। বেচারি ভদ্রলোকের জন্মতিথিতে এমন একটা ঘটনা ঘটার জন্য আমারও খারাপ লাগছিল।

আমরা সবাই এসে বসবার ঘরে বসেছিলাম, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফেলুদা কেন যে, ‘আমি আসছি’ বলে উঠে গেল তা জানি না। অবিশ্যি মিনিট দুয়েকের মধ্যে আবার ফিরে এল।

শঙ্করবাবু অতিথিদের সামনে যথাসম্ভব স্বাভাবিক হাসিখুশি ব্যবহার করছিলেন। এমনকী তাঁর আশ্চর্য প্রপিতামহ সম্বন্ধে অদ্ভুত সব ঘটনাও বলছিলেন, কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম যে সেটা করতে তাঁর বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক। এইভাবে চলার পর হাসপাতাল থেকে ডাঃ সরকারের ফোন এল। জয়ন্তবাবুর জ্ঞান হয়েছে। তিনি অনেকটা ভাল। মনে হচ্ছে কাল সকালেই আসতে পারবেন।

এই সুখবরের পর অবিশ্যি ঘরের আবহাওয়া খানিকটা হালকা হল, কিন্তু আমি জানি যে শঙ্করবাবুর মোটেই ভাল লাগছে না, কারণ চোরের রহস্য রহস্যই থেকে যাবে।

খাওয়া দাওয়ার পর, ভিডিও-ক্যাসেট ছবি দেখতে চাই কি না জিজ্ঞেস করাতে আমরা সকলেই না বললাম। এ অবস্থায় ফুর্তি চলে না। তাই ম্যাজিকও বাদ পড়ল।

সকলকে গুড নাইট জানিয়ে নিজেদের ঘরে আসতেই আমি যে প্রশ্নটা ফেলুদাকে করব ভাবছিলাম, সেটা লালমোহনবাবু করে ফেললেন।

আপনি তখন ফস করে বেরিয়ে কোথায় গেলেন মশাই?

খুড়িমার ঘরে।

খুড়িমাকে দেখতে গেসলেন? অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্নটা করলেন লালমোহনবাবু।

সেই সঙ্গে অবিশ্যি সিন্দুকের হাতল ধরে একটা টানও দিয়ে এলাম।

খোলা নাকি?

বন্ধ। সেটাই স্বাভাবিক। যে ভাবে ঘরের দরজার দিকে পা করে পড়েছিলেন ভদ্রলোক, তাতে মনে হয়। ঘরে ঢোকার আগেই পড়েছেন।

কিন্তু চাবিটা কোথায়, ফেলুদা? আমি জিজ্ঞেস করলাম। প্রশ্নটা কিছুক্ষণ থেকেই আমার মাথায় ঘুরছিল।

ফেলুদা বলল, শঙ্করবাবু হয়তো দুর্ঘটনায় ওটার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন।

কথাটা বলতে বলতেই শঙ্করবাবু এসে ঢুকলেন আমাদের ঘরে। দেখুন তো কী বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল! বললেন ভদ্রলোক। জয়ন্তর আর একবার এরকম হয়েছিল। ওর ব্লাড প্রেশারটা একটু বেশি নেমে যায় মাঝে মাঝে।

ফোনে আর কী বললেন ডাঃ সরকার?

সেটাই তো বলতে এলাম। তখন লোকজনের সামনে বলিনি। চাবির কথাটা তো গোলমালে ভুলেই গিয়েছিলাম; এখন কী হয়েছে জানেন তো? ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করতে বললেন জয়ন্তর কাছে চাবি ছিল না। হয়তো অজ্ঞান হবার সময় হাত থেকে পড়ে গেছে।

আপনি খুঁজেছেন চাবি?

তন্ন-তন্নকরে। সিঁড়ি, ল্যান্ডিং, সদর দরজার বাইরে, কোথাও বাদ দিইনি। সে চাবি হাওয়া।

যাকগে, ডুপ্লিকেট আছে তো, বলল ফেলুদা।ও নিয়ে ভাববেন না।

তা না হয় ভাবব না, গম্ভীরভাবে বললেন শঙ্করবাবু, কিন্তু রহস্য তো দূর হল না! চার তো অজ্ঞাতেই রয়ে গেল। আর আপনাকে একটা মাথা খেলানোর সুযোগ দেব ভেবেছিলাম, সেটাও হল না।

তাতে কী হল? ফেলুদা বলল। এখানে এসে লাভ হয়েছে বিস্তর। একে এরকম বাড়ি, তার উপর আপনার আতিথেয়তা।

শঙ্করবাবু যাবার আগে বলে গেলেন যে সকালে সাড়ে ছটায় চা দেবে, আর আটটায় ব্রেকফাস্ট।

এটা অ্যাটেমটেড মার্ডার নয়তা মশাই? লালমোহনবাবু ফিস্ ফিস্ করে প্রশ্ন করলেন।

মিঃ কাঞ্জিলাল আর মিঃ ম্যাজিশিয়ান দুজনেই কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিলেন।

মাডারের দরকার কী? কার্যসিদ্ধির জন্য তো শুধু অজ্ঞান করলেই চলে।

কার্যসিদ্ধি?

জয়ন্তবাবুকে অজ্ঞান করে তাঁর হাত থেকে চাবিটা নিয়ে সিন্দুক খুলে যা বার করার বার করে আবার হাতে চাবি গুঁজে দিয়ে চলে আসা।

সর্বনাশ! এটা তো খেয়াল হয়নি আমার। আমি বললাম তাই যদি হয়ে থাকে তা হলে তো এখন তিনজনের জায়গায় সাসপেক্ট মাত্র দুজন—কাঞ্জিলাল আর কালীনাথ।

নারে তোপ্‌সে, বলল ফেলুদা ব্যাপারটা অত সহজ নয়। জয়ন্তবাবুর মাথায় কেউ বাড়ি মারলে তো সেটা তিনি জ্ঞান হলে বলতেন; তা তো বলেননি। আর অজ্ঞান করে যে সিন্দুক খুলবে সেটাই বা কী করে সম্ভব-খুড়িমা তো ঘরে থাকতে পারেন। একজন বাইরের লোক সিন্দুক খুলছে দেখলে কি তিনি চুপ করে থাকতেন?

একটা আশার আলো জুলতে না জ্বলতে নিভে গেল। আমি শুয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু অত তাড়াতাড়ি আর ঘুমোনো হল না। ফেলুদা এমনিতেও পায়চারি করছিল, বারোটা নাগাদ লালমোহনবাবু হঠাৎ আমাদের ঘরে এসে নিচু গলায় বললেন, বারান্দায় গোসলুম। চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, মশাই—উপচে পড়ে আলো!

উপ্‌চে নয়, উছলে, বলল ফেলুদা।

সরি, উছ্‌লে। কিন্তু একবার বাইরে এসে দেখুন। এ দৃশ্য দেখবেন না। কখনও।

আপনি এক কাব্যি করবেন, এটা হতে দেওয়া যায় না, বলল ফেলুদা। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম।

বাইরে গিয়ে মনে হল এ যেন দিনের বেলার দৃশ্যর চেয়েও ঢের বেশি সুন্দর। একটা পাতলা কুয়াশা নদীর ওপারটাকে প্রায় অদৃশ্য করে ফেলেছে। গঙ্গার আবছা গাঢ় জলের উপর ছড়ানো চাঁদির টুকরোগুলো ধীরে ধীরে দুলছে। তারই মধ্যে ঝিঝির ডাক, হাসনুহানার গন্ধ, ফুরফুরে বাতাস, সব মিলিয়ে সত্যিই অমরাবতী।

ফেলুদা ত্রয়োদশীর চাঁদটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, চাঁদের মাটিতে মানুষের পা পড়লেও, এর মজা কোনওদিন নষ্ট করতে পারবে না।

একটা মারাত্মক পোয়েম আছে চাঁদ নিয়ে, বললেন লালমোহনবাবু।

আপনার এথিনিয়াম ইনস্টিটিউশনের সেই বাংলার শিক্ষকের লেখা?

ইয়েস। বৈকুণ্ঠ মল্লিক। এই পোড়া দেশে লোকটা রেকগনিশন পেলে না, কিন্তু আপনি শুনুন কবিতাটা। শোনো, তপেশ।

এতক্ষণ আমরা নিচু গলায় কথা বলছিলাম। কিন্তু আবৃত্তির সময় লালমোহনবাবুর গলা আপনা থেকেই চড়ে গেল।

আহা, দেখ চাঁদের মহিমা
কতু বা সুগোল রৌপ্যথালি
কতু আধা কভু সিকি কভু একফালি
যেন সদ্য কাটা নখ পড়ে আছে নভে–
সেটুকুও নাহি থাকে, যাবে
আসে অমাবস্যা––
সেই রাতে তুমি তাই
অচন্দ্রমপশ্যা!

বুঝতেই পারছি, তপেশ, পদটি একজন লেডিকে অ্যাড্রেস করে লেখা।

একজন লেডিকে তো আপনি আবৃত্তির ঠেলায় ঘর থেকে টেনে বার করেছেন দেখছি।

ফেলুদার দৃষ্টি দোতলার বারান্দার দিকে। এই যে খুড়িমার ঘর। বৃদ্ধ বারান্দার দরজার মুখটাতে এসে দাঁড়িয়েছেন; মিনিটখানেক এদিক ওদিক দেখে আবার ভিতরে ঢুকে গেলেন।

এর পরে আমরা ঘাটের সিঁড়িতে গিয়ে বসেছিলাম আধা ঘণ্টা। মনমেজাজ তাজা, রাতের খাওয়া হজম। তারপর এক সময় ফেলুদা তার হাতঘড়ির রেডিয়াম ডায়াল চোখের সামনে ধরে বলল, পৌনে এক।

আমরা তিনজনেই উঠে পড়লাম, আর তিনজনেই একসঙ্গে শুনলাম শব্দটা।

সেটা যেন আসছে বাড়ির দোতলা থেকেই।

খট্ খট্ খটু খট্ ঠং খট্ খট্...

আমরা ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলাম।

সিঁদ কাটছে নাকি মশাই? লালমোহনবাবু ফিসফিস্ করে জিজ্ঞেস করলেন। আলো জ্বলছে। আওয়াজটা আসছে ওই ঘর থেকে।

খট্ খট্ খটু খট্ ঠং ঠং...

কিন্তু এই ঘর ছাড়াও আরেকটা ঘরে আলো জ্বলছে। দক্ষিণ দিকের ঘরটা। খোলা জানাল দিয়ে দেখা যাচ্ছে একজন লোক দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে উত্তেজিত ভাবে কথা বলছে।

এবার লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিঃ কাঞ্জিলাল, বলল ফেলুদা।ওটাই শঙ্করবাবুর ঘর।

এই মাঝরাত্তিরে কী আলোচনা মশাই? লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

জানি না, বলল ফেলুদা। ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু হবে।

আপনাদেরও ঘুম আসছে না?

নতুন গলা পেয়ে চমকে উঠে দেখি ম্যাজিশিয়ান কালীনাথবাবু।

ভদ্রলোক সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। খট্ খট্ শব্দটা এখনও হয়ে চলেছে। কালীনাথবাবুর ঘাড় ঘুরে গেল সেই দিকে।

কীসের শব্দ বুঝতে পারছেন তো? প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

হামানদিস্তা কি? ফেলুদা বলল।

ঠিক বলেছেন। এই মাঝরাত্তিরে বুড়ি পান ছাঁচতে বসেন। এ শব্দ আগেও পেয়েছি।

কথাটা বলে হাতের তেলের আড়ালে দেশলাই জ্বলিয়ে সিগারেট ধরিয়ে ফেলুদার দিকে একটা সেয়ানা দৃষ্টি দিয়ে বললেন, বনোয়ারিলালের জীবনী লেখার জন্য গোয়েন্দার দরকার হল কেন?

আমি তো থ! লালমোহনবাবুর মুখ হাঁ হয়ে গেছে। ফেলুদা একটু হালকা হেসে বলল, যাক্, অন্তত একজন আমার আসল পরিচয়টা জানে দেখে ভালই লাগল।

তা জানবে না কেন মিঃ মিত্তির? এ শর্মা অনেক ঘাটের জল খেয়েছে। অনেক কিছু দেখে শুনে চোখ কান দুইই খুলে গেছে।

ফেলুদা একদৃষ্টি চেয়ে আছে ভদ্রলোকের দিকে। তারপর বলল, আপনি কি রহস্যই করবেন, না খুলে বলবেন?

খুলে আর কজনে বলতে পারে মিঃ মিত্তির? স্পষ্টবক্তা আর কজনে হয়? বেশির ভাগই তো মুখচারা। আর দুঃখের বিষয়, আমিও যে সেই দলেই পড়ি। আপনি গোয়েন্দা, খুলে বলার কাজ হল আপনার; তবে আপনাকে আমি একটা কথা বলতে চাই। এখানে এসে আপনার পেশাটাকে কাজে লাগানোর কথা ভুলে যান। অমরাবতীতে এসেছেন, দুদিন ফুর্তি করে গঙ্গার হাওয়া খেয়ে ফিরে যান। নইলে বিপদে পড়তে পারেন।

আপনার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ।

কালীনাথবাবু নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

লোকটা অনেক কিছু জানে বলে মনে হচ্ছে? চাপা গলায় বললেন লালমোহনবাবু।

একটা জিনিস তো জানতেই পারে, বলল ফেলুদা।

কী? আমরা দুজনে একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম।

চুরিটা কে করেছিল। যে করেছিল। সে তে ওঁর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল।

আমি বললাম, কিন্তু সেটা তো উনি নিজেও করে থাকতে পারেন। উনি তো হাত সাফাই জানেন।

এগজ্যাক্টলি, বলল ফেলুদা।

৭৭

৪. জিনিয়াস

সাড়ে ছটায় বেড টি না দিলে হয়তো ঘুম ভাঙতে আরও দেরি হত, কিন্তু ফেলুদাকে দেখে। মনে হল সে অনেকক্ষণ আগেই উঠেছে। জিজ্ঞেস করাতে বলল, শুধু উঠেছি নয়, এর মধ্যে একটা চক্করও মেরে এসেছি।

কোথায়?

শহরের দিকে।

কী দেখলে?

কী দেখলাম না সেটাই বড় কথা।

কিছু বুঝতে পারলে?

পানিহাটিতে আসা বৃথা হয়নি এটা বুঝেছি।

লালমোহনবাবু এসে বললেন এমন সলিড় ঘুম নাকি ওঁর অনেকদিন হয়নি।

খুড়িমার উঠতে দেরি দেখে তিনিও খুব সলিড ঘুমিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে, বলল ফেলুদা।

আমি বললাম, সেটা আবার কী করে জানলে?

অনন্তকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলল। মা-ঠাকরুণ এখনও গঙ্গাস্নানে যাননি। এমনিতে ছটার মধ্যে নাকি ওঁর স্নান সারা হয়ে যায়।

আমরা তিনজন বারান্দায় গিয়ে বসেছিলাম, মিনিট দশোকের মধ্যে শঙ্করবাবু এসে পড়লেন। স্নান-টান সেরে ফিটফাট।

আমি কিন্তু ধরা পড়ে গেছি, মিঃ চৌধুরী, বলল ফেলুদা।আপনার বাল্যবন্ধু আমায় চিনে ফেলেছেন।

সে কী?

আপনি ঠিকই বলেছিলেন। ভদ্রলোক গভীর জলের মাছ।

তা হলে কি বলছেন আপনার পরিচয়টা দিয়েই দেব?

তা হলে কিন্তু সেই সঙ্গে আপনার জানিয়ে দিতে হবে আপনি কেন আমাকে ডেকেছেন। অর্থাৎ এতদিন যে কথাটা চেপে রেখেছিলেন সেটা প্রকাশ করতে হবে।

শঙ্করবাবুর কপালে আবার দুশ্চিন্তার রেখা দেখা দিল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কাঞ্জিলাল আর কালীনাথবাবু বারান্দায় এসে পড়লেন, আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। কাঞ্জিলাল আর. কালীনাথ বারান্দায় রয়ে গেলেন, আমরা চারজন সদর দরজায় গিয়ে হাজির হলাম।

লাল ক্রস-মারা একটা কালো অ্যামবাসাডর থেকে নামলেন জয়ন্তবাবু আর ডাঃ সরকার। জয়ন্তবাবুর মাথার পিছনের চুল খানিকটা কামিয়ে সেখানে প্লাস্টার লাগানো হয়েছে।

জয়ন্তবাবু নেমেই তাঁর দাদার কাছে ক্ষমা চাইলেন। –ভেরি সরি। তোমার জন্মতিথিতে এমন একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেললাম। আসলে প্রেশারটা…।

কোনও চিন্তা নেই, বললেন ডাঃ সরকার। আমি ওষুধ দিয়ে দিয়েছি। তবে রোদে বেশি ঘোরাঘুরি চলবে না।

আপনারা চা খাবেন তো? বললেন শঙ্করবাবু!

তা হলে মন্দ হত না। চা-পানের সময় পাইনি এখনও।

এরা সব কোথায়? জয়ন্তবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

বারান্দায়, বললেন শঙ্করবাবু।

জয়ন্তবাবু আর ডাঃ সরকার বারান্দার দিকে চলে গেলেন।

চলুন, সকলে একসঙ্গেই বসা যাক, ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন শঙ্করবাবু!

দাঁড়ান, আগে একটা কাজ সেরে নেওয়া দরকার।

ফেলুদা কথাটা বেশ জোরের সঙ্গেই বলল। কী কাজের কথা বলছে ও?

কাজ? শঙ্করবাবু একটু যেন অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলেন।

আপনার খুড়িমার কাছে সিন্দুকের যে ডুপ্লিকেট চাবিটা আছে সেটা চাইলে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।

তা নিশ্চয়ই যাবে, কিন্তু–

একবার সিন্দূকটা খুলে দেখতে চাই।

খুড়িমার ঘরে গিয়ে দেখি বুড়ি গামছা নিয়ে স্নানে বেরোচ্ছেন।

আজ তোমার এত দেরি? শঙ্করুব্বাবু প্রশ্ন করলেন।

আর বলিস না। চোখ মেলে দেখি ঝাঁ ঝাঁ রোদ। একেকদিন কী যে হয়!

তোমার চাবিগোছাটা একবার দিতে হবে খুড়িমা। সিন্দুকটা খুলব।

কিন্তু তোর কাছে যে- ?

আমারটা খুঁজে পাচ্ছি না।

খুড়িমা আলমারি খুলে চাবির গোছা বার করে দিয়ে চলে গেলেন।

শঙ্করবাবু সিন্দুকের দিকে এগিয়ে গেলেন, আর সেই ফাঁকে কেন জানি ফেলুদা হামানদিস্তাটা হাতে নিয়ে একবার নেচেচেড়ে দেখল।

সর্ব্বনাশ!

শঙ্করবাবুর চিৎকারে চমকে লালমোহনবাবু সেলিম আলির বইটা তাঁর হাত থেকে ফেলেই দিলেন।

থলি বাক্স কিছুই নেই, বলল ফেলুদা।

শঙ্করবাবুর ফ্যাকাসে মুখ দিয়ে কথাই বেরোচ্ছে না।

ওটা বন্ধ করুন, বলল ফেলুদা।তারপর চলুন নীচে যাওয়া যাক। সত্য উদঘাটনের সময় এসেছে। আমার আসল পরিচয়টা সকলকে জানিয়ে দিন এবং কতকগুলো প্রশ্ন করব। সেটাও জানিয়ে দিন।

বুঝতে পারছি শঙ্করবাবুকে অনেকখানি মনের জোর প্রয়োগ করতে হচ্ছে, কিন্তু তিনি গত বছরের চুরির ব্যাপারটা আর আজ এইমাত্র সিন্দুক খুলে যা দেখলেন সেটা মোটামুটি গুছিয়ে সকলকে বলে বললেন, আমার বাড়িতে আমারই অতিথি হয়ে এসে আমার এত কাছের লোক যে এমন একটা কাজ করতে পারে সেটা স্বপ্নেও ভাবিনি। কিন্তু ঘটনা যে ঘটেছে তাতে কোনও ভুল নেই, আর সেই কারণেই আমি কলকাতার স্বনামধন্য ইনভেসটিগেটর প্রদোষ মিত্রকে ডেকেছি। এর কিনারা করার জন্য। ইনি তোমাদের কয়েকটা প্রশ্ন করবেন। আশা করি তোমরা তার ঠিক জবাব দেবে।

সকলে চুপ। কার মনে কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে দেখে বোঝার উপায় নেই।

ফেলুদা শুরু করল। প্রথম প্রশ্নটা ডাঃ সরকারকে, আর সেটা যাকে বলে অপ্রত্যাশিত।

ডাঃ সরকার, আপনাদের এই পানিহাটিতে কটা হাসপাতাল আছে?

একটাই বললেন ডাঃ সরকার।

তার মানে সেখানেই আপনি নিয়ে গিয়েছিলেন জয়ন্তবাবুকে, আর সেখান থেকেই কাল রাত্রে ফোন করেছিলেন?

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন জানতে পারি কি?

কারণ আজ সকালে আমি সে হাসপাতালে গিয়েছিলাম, জয়ন্তবাবু সেখানে যাননি।

ডাঃ সরকার হাসলেন।

কাল রাত্রে যে আমি হাসপাতাল থেকে ফোন করেছিলাম সে কথা তো আমি শঙ্করবাবুকে বলিনি।

তবে কোত্থেকে করছিলেন?

আমার বাড়ি থেকে। কাল যাবার পথেই জয়ন্তবাবুর জ্ঞান হয়। তখন বুঝতে পারি আঘাত গুরুতর নয়, কনকাশন হয়নি। তবু একবার দেখব বলে আমার বাড়িতেই নিয়ে যাই। তখনই ঠিক করি রাত্তিরটা ওখানে রেখে সকালে পৌঁছে দিয়ে যাব।

এবার জয়ন্তবাবুকে একটা প্রশ্ন, বলল ফেলুদা। আপনি কাল যে সিন্দুক খোলার জন্য চাবিটা নিলেন, সেটা তো আপনার হাতেই ছিল?

হ্যাঁ, কিন্তু মাথা ঘুরে পড়ার পর আর হাতে নাও থাকতে পারে।

হাতে না থাকলেও, কাছাকাছিই পড়ে থাকার কথা। কিন্তু তা তো ছিল না।

সেটার আমি কী জানি? চাবি আপনারা খুঁজে পেলেন কি না পেলেন তার আমি কী করতে পারি? আপনি কী বলতে চাইছেন সেটা সরাসরি বলুন না।

আর একটা প্রশ্ন আছে, সেটা ডাক্তারকে। তার পরেই সরাসরি বলছি। ডাঃ সরকার, হিমোগ্লোবিন বলে একটা পদার্থ আছে সেটা আপনি জানেন নিশ্চয়ই।

কেন জানব না?

সাধারণ লোকের চোখে সেটার রঙের সঙ্গে রক্তের কোনও তফাত ধরা পড়ে না সেটাও নিশ্চয়ই জানেন।

ডাক্তার সরকার গলা খাক্‌রানি দিয়ে মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানিয়ে দিলেন।

আমার বিশ্বাসটা কী তা হলে এবার বলি? বলল ফেলুদা। সকলে একদৃষ্টি চেয়ে আছে ফেলুদার দিকে। আমার বিশ্বাস জয়ন্তবাবু অজ্ঞান হননি, অজ্ঞান হবার ভান করেছিলেন– ডাক্তার সরকারের সঙ্গে একজোট হয়ে। কারণ তাঁদের দুজনের এই বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার দরকার ছিল!

ননসেন্স! চেঁচিয়ে উঠলেন জয়ন্তবাবু। কেন, চলে যাব কেন?

কারণ মাঝরাত্তিরে গোপনে আবার ফিরে আসবেন বলে।

ফিরে আসব?

হ্যাঁ। উত্তরের ফটক দিয়ে ঢুকে, পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আপনার মার ঘরে যাবেন বলে।

আপনি একটু বাড়াবাড়ি করছেন মিঃ মিত্তির। মাঝ রাত্তিরে মা-র ঘরে যাব, আর মা টের পাবেন না? মা রাত্তিরে তিনঘণ্টার বেশি ঘুমোন না সেটা আপনি জানেন?

এমনিতে ঘুমান না—কিন্তু ঘুমের ওষুধ খাওয়ালে? ধরুন যদি ডাক্তারবাবু, গতকাল তাঁকে দেখার সময় তাঁর দুধভাতে কিছু মিশিয়ে দিয়ে থাকেন?

জয়ন্তবাবু আর ডাঃ সরকার দুজনেরই ডোন্ট-কেয়ার ভাবটা মিনিটে মিনিটে কমে আসছে সেটা বুঝতে পারছি। ফেলুদা বলে চলল, আপনার ফিরে আসতে হয়েছিল কারণ এক বছর আগে যে কাঁচা কাজটা করেছিলেন, এবার আর সেরকম করলে চলত না। শঙ্করবাবুর পুরো প্ল্যানটাই ভেস্তে দিয়ে মাঝরাত্তিরে এসে চুরিটা সারার দরকার ছিল। সে চুরি ধরা পড়ত কবে তার কোনও ঠিক নেই। অবিশ্যি চাবি আপনার কাছে ছিল না, তাই আপনার মা-র আলমারি থেকে ডুপলিকেট বার করে নিতে হয়েছিল। সেই সময় আমার এই বন্ধুর আবৃত্তি শুনে আপনি কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে পড়েন। তাই গায়ে একটা থান জড়িয়ে দরজার মুখে এসে প্রমাণ করতে হয়েছিল যে আপনার মা জেগেই আছেন, এভরিথিং ইজ অল রাইট। তার পরে আমাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করার জন্য হামানদিস্তা পিটতে শুরু করেন। এতেও আমার সন্দেহ হয়েছিল, কারণ হামানদিস্তায় পান থাকলে শব্দটা হয় একটু অন্যরকম; এটা ছিল ফাঁকা শব্দ।

সবই বুঝলাম, মিঃ মিত্তির, বললেন জয়ন্তবাবু, কিন্তু তারপর?

তারপর চাবি দিয়ে সিন্দুক খোলা।

আপনি কোন অপরাধে আমাদের অভিযুক্ত করছেন, মিঃ মিত্তির? অজ্ঞান হবার ভান করা? আমার মাকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া? রাত্তিরে ফিরে এসে ডুপলিকেট চাবি বার করে সিন্দুক খোলা?

তার মানে এর সবগুলোই করেছেন স্বীকার করছেন তো?

এর কোনওটার জন্য শাস্তি হয় না সেটা আপনি জানেন? আসল ব্যাপারটায় আসছেন না। কেন আপনি?

ঘটনা যে দুটো জয়ন্তবাবু, একটা তো নয়। আগে প্রথম ঘটনাটা সেরে নিই-এক বছর আগের চুরি।

সেটা আপনি সারবেন কী করে, মিঃ মিত্তির? আপনি কি অন্তর্যামী? আপনি তখন কোথায়?

আমি ছিলাম না ঠিকই, কিন্তু অন্য লোক তো ছিল। যিনি চুরি করেছিলেন তাঁর ঠিক পাশেই লোক ছিল। তাদের মধ্যে অন্তত একজন কি টের পেয়ে থাকতে পারেন না?

এবারে শঙ্করবাবু কথা বললেন। তিনি বেশ উত্তেজিত।

এটা আপনি কী বলছেন, মিঃ মিত্তির? চুরি হয়েছে সেটা জানবে অথচ আমায় বলবে না, আমার এত কাছের লোক হয়ে?

ফেলুদা এবার ম্যাজিশিয়ান কালীনাথবাবুর দিকে ঘুরল।

আপনি কাল রাত্তিরে কী বিপদের কথা ভেবে আমাকে তদন্ত বন্ধ করতে বলছিলেন সেটা বলবেন, কালীনাথবাবু?

কালীনাথবাবু হেসে বললেন, আপ্রিয় সত্য প্রকাশ করায় বিপদ নেই? শঙ্করের মনের অবস্থাটা ভেবে দেখুন তো!

না, নেই বিপদ, দৃঢ়স্বরে বললেন শঙ্করবাবু! অনেক'দিন ব্যাপারটা ধামা চাপা রয়েছে। এবার প্রকাশ হওয়াই ভাল। তুমি যদি কিছু জেনে থাক তো বলে ফেলো, কালীনাথ।

সেটা বোধহয় ওঁর পক্ষে সহজে নয়, মিঃ চৌধুরী, বলল ফেলুদা, কারণ তদন্তে চোর ধরা পড়লে যে ওঁরাও বিপদ হত। এই একটা বছর যে উনি চোরকে নিংড়ে শেষ করেছেন।

ব্ল্যাকমেল?

ব্ল্যাকমেল, শঙ্করবাবু। সেটা উনিও স্বীকার করবেন না, চারও স্বীকার করবেন না। অবিশ্যি চোরের যে দোসর আছে সেটা সম্ভবত কালীনাথবাবু জানতেন না, উনি একজনকেই লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু আমার ধারণা এই অনবরত ব্ল্যাকমেলিং-এর ঠেলায় দ্বিতীয় চুরিটার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আর তাই–

ভুল! ভুল? তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন জয়ন্তবাবু।সিন্দুক থেকে যা নেবার তা আগেই নেওয়া হয়ে গেছে। বনোয়ারিলালের আর একটি জিনিসও তাতে নেই! সিন্দুক খালি!

তার মানে আমার বাকি অভিযোগ সবই সত্যিই?

কিন্তু, কাল রাত্তিরে কুকীর্তিটা কে করেছে সেটা বলছেন না কেন?

সেটাও বলছি, কিন্তু তার আগে আপনার স্পষ্ট স্বীকারোক্তিটা চাই। আপনি বলুন জয়ন্তবাবু–ডাঃ সরকার আর আপনি মিলে গতবছর বারোটার মধ্যে থেকে একটি স্বর্ণমুদ্রা সরিয়েছিলেন কি না।

জয়ন্তবাবুর মাথা হেঁট হয়ে গেছে; ডাঃ সরকার দুহাতে রগ টিপে বসে আছেন।

আমি স্বীকার করছি, বললেন জয়ন্তবাবু। ফেলুদা পকেট থেকে টেপ রেকর্ডারটা বার করে চালু করে আমার হাতে দিয়ে দিল।

আমি দাদার কাছে ক্ষমা চাইছি। সে স্বর্ণমুদ্রা ডাঃ সরকারের কাছেই আছে, সেটা ফেরত দেওয়া হবে। আমাদের দুজনেরই অর্থাভাব হয়েছিল। একটার জায়গায় বারোটার পুরো সেটটা বিক্রি করলে প্রায় একশো গুণ বেশি দাম পাওয়া যাচ্ছিল, তাই...

তাই বাকি এগারোটা নেবার কথা ভাবছিলেন।

স্বীকার করছি, কিন্তু চোর আরও আছে, মিঃ মিত্তির। যে লোক ব্ল্যাকমেল করতে পারে–

–সে লোক চুরি করতে পারে, বলল ফেলুদা। কিন্তু তিনি চুরি করেননি।

তা হলে? প্রশ্ন করলেন শঙ্করবাবু।

ওগুলো সরিয়েছেন প্রদোষ মিত্র।

ফেলুদা ঘর থেকে বাকি মাল এনে টেবিলের উপর রাখল। সকলের মুখ হাঁ হয়ে গেছে।

এই হল বনোয়ারিলালের বাকি সম্পত্তি, বলল ফেলুদা, মেঝেতে চাবি না পেয়ে, এবং রক্তের বদলে হিমোগ্লোবিন দেখে মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাই যখন আপনাকে ধরাধরি করে নীচে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন বাধ্য হয়েই আমাকে পিকপকেটের ভূমিকা অবলম্বন করতে হয়েছিল। ভাগ্য ভাল যে চাবিটা ছিল আপনার প্যান্টের ডান পকেটে। বাঁ পকেটে থাকলে পেতাম না। আপনাকে নিয়ে যাবার পর বৈঠকখানায় এসে বসি। তখনই এক ফাঁকে বেরিয়ে গিয়ে আমি সিন্দুক খুলে জিনিসগুলো বার করে আমার ঘরে রেখে দিই। আমি জানতাম যে বিপদের আশঙ্কা আছে।–এই নিন। আপনার চাবি, মিঃ চৌধুরী। এরপর কী করা হবে সেটা আপনিই স্থির করুন; আমার কাজ এখানেই শেষ।

ফেরার পথে লালমোহনবাবুর মুখে আর একটা আবৃত্তি শুনতে হল। এটাও বৈকুণ্ঠ মল্লিকের লেখা। নাম হল জিনিয়াস–

অবাক প্রতিভা কিছু জন্মেছে এ ভবে
এদের মগজে কী যে ছিল তা কে কবে?
দ্য ভিঞ্চি আইনস্টাইন খনা লীলাবতী
সবারেই স্মরি আমি, সবারে প্রণতি।
৭৭